তৃতীয় অধ্যায়

কবিতায় স্থানিকতা: অসম

আমাদের আলোচ্য বিষয় যেহেতু অসমের কবিতায় স্থানিকতা, সুতরাং বরাক উপত্যকার কবিতায় স্থানিক বৈশিষ্ট্য স্বাভাবিকভাবেই চলে আসবে। কারণ অসমের বাঙালির কবিতাচর্চাকে দুটি ভাগে ভাগ করেছিল এ অঞ্চলের বাসিন্দারা। যদিও কবিতার কোনো বিভাজন হয় না। কখনো কোনো ভৌগোলিক সীমারেখায় একে আবদ্ধও করা যায় না— এটাই ধ্রুবসত্য।

তবু যুক্তি হিসেবে বলা যায়, শিলচর শহরকে ঘিরে এই উপত্যকার জনসংখ্যার ৯০ শতাংশই বাঙালি। আর তাই বহুকাল ধরেই বরাকের বাংলাচর্চা বেশ ঋদ্ধ। যা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা সম্পর্কে বলা যায় না। বরাক উপত্যকার তুলনায় ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বাংলা কবিতাচর্চা নিতান্তই অর্বাচীন! বরাকভূমির হাজারো সমস্যা তবু জীবন থেমে নেই কোনো বাঁকের অন্ধকারে। সমস্যার মেঘ ভেদ করে শোনা যায় কবিতার জোরালো প্রতিধ্বনি।

বরাক উপত্যকার কবিতা চর্চায় স্থানিক বৈশিষ্ট্য যথেষ্ট পরিমানে বিদ্যমান।

বরাকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি অশোকবিজয় রাহা[১] 'নাগা রানি' শিরোনামেই একটি কবিতা লিখেছেন। প্রশ্ন উঠতে পারে নাগাল্যান্ডের প্রসঙ্গ বরাকের স্থানিক বৈশিষ্ট্যে আসবে কেন? মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা, মণিপুর, মিজোরাম-এর অনাবিল সৌন্দর্যে বেষ্টিত বরাক উপত্যকা। আর কবির চোখে প্রকৃতির সৌন্দর্য কোনো স্থান-কাল-পাত্র বিচারে আসে না। তাই অশোকবিজয় রাহাও 'নাগারানি' কবিতায় লিখেছেন—

'দেশমুখের বাংলোয় নৈশভোজের নিমন্ত্রণ ছিল কাল
ফিরেছি অনেক রাতে।
পাহাড়িদের ওপর একখানা বই লিখেছে ও,
একটি অধ্যায় পড়লে—'নাগা নৃত্য'
লোকটা জহুরি।
.....
'নাগারা সত্যি বীরের জাত

একটি আশ্চর্য জিনিস দেখাবো আপনাকে আজ

বলবেন না কাউকে

আমার সবচেয়ে দুর্লভ সংগ্রহ'—

বলতে বলতে লোকটা ঝড়ের বেগে ছুটে বেড়িয়ে যায়।

.....

'এক মহীয়সী নাগা-রানীর পবিত্র চুল

তরুণী বীরাঙ্গনা...' (উত্তর পূর্বের বাংলা কবিতা, পৃ. ২১)

কিংবা তাঁর 'ডিহাং নদীর বাঁকে'[২] কবিতায় কবি 'ডিহাং নদী'র তীর ছাড়ার আগে বুকে এক ঘরছাড়ার অজানা কষ্ট নিয়ে লেখেন—

'একটি রাতের একটু দেওয়া নেওয়া

এই তো হল শেষ,

আজ সকালে পাহাড়-দেশের মেয়ে,

ছাড়ব তোমার দেশ।

মনের মাঝে ঘরছাড়া কেউ আছে

চিনিনে কেউ তাকে,

যাবার বেলা বিদায় বলে যাব

ডিহাং নদীর বাঁকে।' (তদেব, পৃ. ২৩)

আবার হেমাঙ্গ বিশ্বাস[৩] 'মা তুমি শিগ্‌গির ফিরে এসো' কবিতায় লেখেন—

'রাজধানীর উপকণ্ঠে—উমখ্রা নদীর বাঁকে'।

—এখানে উল্লেখ্য যে অবিভক্ত অসমের রাজধানী ছিল শিলং। তাই 'উমখ্রা'[৪] নদীর প্রসঙ্গ এনেছেন কবি। এই কবিতাতেই আবার পাওয়া যায়—

'শিলং কি টেকসাস?'

কিংবা

'সুদূর খাসিয়া পুঞ্জিতে

ফুলকুমারী কাসাম্বিউ।

থেকে থেকে কেঁদে উঠছিল—

ইম্মেই ওয়ান ক্লোয়

মা, তুমি শিগ্‌গির ফিরে এসো।' (তদেব, পৃ. ২৯)

এই কবিই আবার তৎকালীন রাজধানী শৈলশহর শিলঙের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে 'শিলঙের চিঠি'[৫] শিরোনামে কবিতায় লিখেছেন—

'এখানে স্তরে স্তরে উতুঙ্গ সবুজ

গাঢ় নীল,

গাঢ় ঘন নীল হয়ে

কালো মেঘে লীন।

মেঘের পিঙ্গল চোখে হঠাৎ বর্ষণ

.....

তৃষাতপ্ত রজঃস্বলা

লুইত উপত্যকায়!' (তদেব, পৃ. ৩০)

উল্লেখ্য যে বরাকের কবি লুইতের অশান্ত পরিবেশের কথাও উল্লেখ করেছেন এই কবিতায়।

হেমাঙ্গ বিশ্বাসের লেখা 'সীমান্ত প্রহরী'[৬] যার কথা শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে মণিপুরি, অসমিয়া বহু শব্দ উঠে এসেছে। যেমন, 'ফানক'[৭]— যা মণিপুরী মেয়েদের পরিধান, লাইছাপি—মণিপুরি কুমারী মেয়ে, আসল অর্থ 'ফুটন্ত ফুল'। অথবা 'থাম্বা থৈবী'[৮] যারা মণিপুরি মহাকাব্যের নায়ক-নায়িকা, এ ছাড়া বিহু[৯], পেঁপা[১০], লুইত[১১] প্রভৃতি পরিচিত অসমিয়া শব্দ তো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এই কবিতায়।

'আকাশ' কাব্যগ্রন্থের কবি মৃণালকান্তি দাশের কবিতায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকার মধ্যেও বিশ্বাস, প্রেম ও নীতিবোধকে সুদৃঢ় করে রাখতে উঠে আসে স্থানিকতা কবি লেখেন—

'ঈশানের রক্ত মেখে এসেছে তো প্রণয় আবার

এখনো তবুও জানি, এই জীবনের জয়

উদ্‌ঘাটিত হবে এই দ্রোহ—দীপ্ত মুক্ত দিগ্বলয়।'

(চিরন্তন) (বাংলা কবিতাচর্চার রূপরেখা, পৃ. ৩৫৮)

উল্লেখ্য 'ঈশান'[১২] বলতে এখানে বরাককে বোঝানো হয়েছে। বরাকের আরেক নাম ঈশান কোণ।

আবার কবি সুধীর সেনের কাব্যেও দেখা যায় বরাকের নিসর্গের ছবি। চলে আসে 'নীলাচল পাহাড় চূড়া'র[১৩] প্রসঙ্গ, কিংবা রিহাং নৃত্যের[১৪] কথা। অবিভক্ত অসমের অগ্রজ কবি সুধীর সেন ত্রিপুরার 'রিহাং নৃত্য' কিংবা অসমের পবিত্র নীলাচল পাহাড়কে অবলীলায় তুলে আনেন তাঁর কবিতায়। আবার রামেন্দ্র দেশমুখ্যের[১৫] কবিতায় এসে দাঁড়ালে দেখি—

'ফুলের পদক দিও তাঁকে মৃত্যুকালে

মাটির তিলক দিও শিল্পিত কপালে,

দিও তাকে বিহঙ্গ পদবী।

মন্ত্রের ভাষায় বলো, কাছাড়ের কবি,

ফিরে এসো জন্মান্তরে মায়ের নিলয়ে

বরাকের বকুলের প্রসন্ন বলয়ে।...' (তদেব, পৃ. ৩৫৯)

উল্লেখ্য কবি কাছাড় কিংবা বরাকের কবিকে মৃত্যুকালে ঐ স্থানের মাটির তিলক লাগানোর কথা বলেছেন, এমনকি জন্মান্তরে আবার এই মাটিতেই ফিরে আসার কথাও উল্লেখ করেছেন।

আবার 'প্রেমিকা শহর' নামের কবিতায় লেখেন—

'শ্রাবস্তী বিদিশা থেকে শিলচর শহর

আরো মনোরমা,

গ্রীবাময় মালোপমা, শ্যামশ্রী শহর

.....

স্তব্ধ এই জন্ম জন্মান্তরে

আজ রাতে বক্ষে বাঁধো প্রেমিকা শহর।' (উত্তর পূর্বের বাংলা কবিতা, পৃ. ৩৮)

বরাকপ্রেমী এই কবি জন্মভূমিকে ভুলতে না পেরে শ্রদ্ধায় মাথা আনত করেন জন্মভূমি শিলচরের কাছে। তিনি এভাবে বলেন—

'গোধুলি-বিমুগ্ধ আমি তোমারি মায়ায়

আমিই কিশোর শিলচর।"

তিনি নিজের সত্তার মধ্যে 'শিলচর'কে প্রতিনিয়ত কিশোর করে রাখতে চেয়েছেন।

বরাকের জনপ্রিয় কবি শক্তিপদ ব্রহ্মচারী। বাস্তবমুখী আবার অসাধারণ রোমান্টিক। শক্তিপদর কলমে যেমন 'মনসামঙ্গল'[১৬]-এর 'সাঁঝের ঝিয়ারি'র[১৭] 'অনন্ত ভাসানে' যাওয়ার দৃশ্য পাঠক মানসচক্ষে দেখতে পান। তেমনি আবার স্থানিকতা ও ভাষা আন্দোলনের ছবিও পাঠক অনুভব করতে পারেন। কবির ভাষায়—

'দশটি ভাই চম্পা আর একটি পারুলবোন

কলজে ছিঁড়ে লিখেছিল, 'এই যে ঈশান কোণ—

কোন্ ভাষাতে হাসে কাঁদে কান পেতে তা শোন্'।'

(উনিশে মে ১৯৬১ শিলচর) (তদেব, পৃ. ৬৪)

ঈশানকোণের বুকে রক্তমাখা এই 'উনিশ মে'-র অনুভূতি পাঠকের মনকে নাড়িয়ে দিয়ে যায়।

আবার, 'উদ্বাস্তুর ডায়েরি' কবিতায় কবি অবিভক্ত অসমে উদ্বাস্তু বাঙালির বেদনার কথা বলেন এভাবে—

'যে কেড়েছে বাস্তুভিটে, সে-ই কেড়েছে ভয়

আকাশ জুড়ে লেখা আমার আত্মপরিচয়।

হিংসাজয়ী যুদ্ধে যাব, আর হবে না ভুল

মেখলা-পরা বোন দিয়েছে একখানা তাম্বুল।' (তদেব, পৃ. ৬৪)

উল্লেখ্য, এখানে 'মেখলা[১৮]-পরা বোনের তাম্বুল[১৯]' দেওয়াটা অবশ্যই অসমের সংস্কৃতির পরিচয়বাহী। উদয়ন ঘোষ ও শান্তনু ঘোষ ছিলেন 'অতন্দ্র'[২০] পরিবারের মেধাবী লেখাকর্মী তাই কাব্যভাষা পেয়েছিলো অনন্য ব্যাপ্তি যার ফলে বৃহৎ কাব্যভুবন সখা বা সখীরূপে সেসময় বরবক্র নদী[২১] তীরে বসে ভাব বিনিময় করতে একটুও কুণ্ঠাবোধ করেনি।

উদয়ন ঘোষের কবিতায় সরাসরি উঠে এসেছে শিলচর শহরের কথা। উদয়ন লেখেন—

'শিলচরের সিটিলাইট জ্বলে উঠলে মনে হয়

আলোকিত শহরের কাছাকাছি আছি।

রাত্রি আরো আলোকিত হয়।'

(দলিলপোড়া রাত: শিলচর ১৯৯০)

আবার, পার্বত্যভূমি অসমের একটি দৃশ্য ফুটে উঠেছে 'পাহাড় লাইন' কবিতায় এভাবে—

'হারাংগাজাও-এর পাহাড়ি রেল স্টেশনে

অস্পষ্ট আলোয় নীল ইউনিফর্ম পরা একটা লোক

অপসৃয়মাণ রেলগাড়ির কাছে লণ্ঠন নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে' (তদেব, পৃ. ৭১)

শান্তনু ঘোষের কবিতায় শোনা যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্রুকলিন ব্রিজের[২২] পরিপ্রেক্ষিতে শহর বরাকের কথা।

'শরীরের ভিতরে চলে গেছে, দিবসরজনীসখী

শোনো যায় কি ডাক্তারের পদধ্বনি তোমার বুকের

গভীরের নিশীথ বেলায়

.....

তোমার পায়ের আশেপাশে, কেশচূড়ে ঐ ধুতরা ফুল বেঁধে

আমি আছি তোমারি কাছাকাছি,

তুমিই আমার কৌতুক, আমার বিষাদ, হে

আমার বরাক কিংবা ব্রুকলীন ব্রিজের শহর'। (বাংলা কবিতাচর্চার রূপরেখা, পৃ. ৩৬০)

(বরাক কিংবা ব্রুকলীন ব্রিজের শহর)

কবি বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য[২৩] আধুনিক জীবনবোধ সম্পন্ন সচেতন কবি। প্রখরও বলা যায়। রমা পুরকায়স্থ বলেছেন, "প্রাকরণিক বিন্যাস দিয়েই তিনি কবিতার সময়কে ধরতে চেয়েছেন।" আধুনিকতা

সম্পর্কে তাঁর ধ্যান-ধারণা ও প্রতিক্রিয়া আলাদা হলেও স্থানিক বৈশিষ্ট্যের থেকে সরে থাকেননি তিনি। আর তাই বিজিৎকুমার 'বরাকভূমির লোক এভাবেই চলে' শিরোনামে কবিতা লিখে বরাকের ঐ সময়ের লৌকিক জীবনের ছবি তুলে ধরেছেন এভাবে—

'মেয়েটা পেরিয়ে গেল এবং ছেলেটা

হাত ধরাধরি করে

না ঠিক হাত ধরে নয়

এক হাতে জুতো ব্যাগ, অন্য হাতে প্রাণ' (উত্তর পূর্বের বাংলা কবিতা, পৃ. ৬৯)

সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিআরটি এফ-এর জোয়ানরা

কবি ছবি গুপ্তা[২৪] বরাক বধূ, শিলং কন্যা। কবিতা তাঁর বিজন দর্পণে প্রতিভাত আলোক সামান্য, শব্দবিভায় গড়ে ওঠা আশ্চর্য আরোগ্য নিকেতন—

'বরাকের নায়রী হবে বোরো চালের মোটা ভাত

ছোট পুকুরের জিয়ল মাছের ঝোল

কুমড়ো ডাঁটার চচ্চড়ি

হাতের রোয়া শীতল পাটি আন্তরিক সহবাস।'

(সহবাস[২৫], শব্দ বিভাবরী[২৬]) (বাংলা কবিতাচর্চার রূপরেখা, পৃ. ৩৬২)

দিলীপকান্তি লস্কর[২৭] শুধু একজন কবিই নন, এমন একজন সম্পাদক যাঁর সম্পাদনায় ২০০২ সালে 'লালন মঞ্চ'[২৮] প্রকাশিত একটি কবিতা সংকলন বেড়িয়েছে '১৯-এর কবিতা ও গান'—এই নামে। যে সংকলনটিকে বরাকের ইতিহাসের রক্তাক্ত ভাষা আন্দোলনের সময়ের দলিল বললে হয়তো অত্যুক্তি হবে না। যাঁর সম্পাদনায় একটি স্থানিক ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে তাঁর কবিতায় স্থানিক বৈশিষ্ট্যের সমাহার ঘটবে না তা কী করে সম্ভব? তাই দিলীপকান্তি লস্কর লেখেন 'বৈধভূমি আসাম'।

'কোথাও দুয়ার খোলা নেই

আমি কড়া নেড়ে আসি ফিরে

কোথাও কি বেরিয়েছে ওরা!

কই গেল পাড়ার সবাই!

নাকি ওরা বাইরে তালা দিয়ে

নিঃশব্দে ভিতরে লুকিয়ে?'

(উত্তর পূর্বের বাংলা কবিতা, পৃ. ১১৫)

এই কবিতায় অসমের অস্থির পরিস্থিতির এক সুস্পষ্ট ছবি ফুটে ওঠে।

সত্তরের দশকের বরাক উপত্যকার কাব্যভূবনে যে কবিরা অনন্য আশাবাদের কুহুকণ্ঠে তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন শংকরজ্যোতি দেব[২৯] ও অমিতাভ দেব চৌধুরী[৩০]।

শংকরজ্যোতি লেখেন, 'সোনাপুর ২০০১' নামে কবিতাটি। উল্লেখ্য ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ও বরাক উপত্যকার মধ্যে সোনাপুর এমন এক স্থান যা দুই উপত্যকার সাক্ষ্য বহন করে। কবি লেখেন—

'মেঘের পাহাড়ে পথের প্রহারে সরল কাদার শোক
বয়ে গেল রাতের ছড়ায়—একটি যুবক
ভাসতে ভাসতে গিয়েছিল চলে সুরমার কোলে
সুনামগঞ্জে।' (তদেব, পৃ. ১৫৬)

আবার কবি 'শিলং' কবিতায় লেখেন—

'শেষের কবিতা-র শহর পেরিয়ে যাই
আজকাল এই পূর্বমেঘের শহর আর
কোনো কথা বলেনা—পাইনের হাওয়া নিয়ে
সন্ধ্যার ত্যাড়াব্যাকা পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি,
.....
আজ দূর থেকে তার দীপাবলীর সাজ দেখি
ভয় করে সন্ধ্যার অন্ধকার।' (তদেব, পৃ. ১৫৭)

আবার অমিতাভ দেব চৌধুরির কবিতায় দেখি 'বরাকভ্যালি এক্সপ্রেস'-এর প্রসঙ্গ। যেখানে কবির অন্তর্মননের এক যন্ত্রণার নৈঃশব্দ্য কবিতার পঙ্‌ক্তিতে বিরাজ করছে। অমিতাভ এভাবে শুরু করেছেন—

'যে ট্রেন যায়নি কোনোদিন, আমি তার যাত্রী ছিলাম
বিদায় চুম্বনগুলি, দেশের ভিটের বাস্তুসাপটির মতো,
কিংবদন্তীজন্ম ফিরে পেল।
অবাক অপেক্ষাডাল খুর ঠুকে ঠুকে রাজপথে নামল গোধূলি।
.....
তবু সেই না যাওয়ার স্বপ্নভ্রষ্ট ছায়া, পরবর্তী প্রতিটি যাওয়ায়
দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হল যে কেবল
.....
যাওয়া-না-যাওয়ার মাঝখানে,
একটি অচল সেতু কারাগার হয়ে ওঠে ক্রমে।

যে ট্রেন যাবে না কোনোদিন, আমরা তার যাত্রী ছিলাম।'

(তদেব, পৃ. ১৬১)

এই কবিতায় বরাককে নিয়ে কবির যে স্বপ্ন ছিল, বরাকের সঙ্গে দেশের বিভিন্ন ঠাঁইয়ের সঙ্গে যোগাযোগে বরাকের ঋদ্ধ হওয়ার যে স্বপ্ন কবি বা কবির মতো আরও কিছু বরাকপ্রেমী বুনেছিলেন, তা আজও সে অর্থে সফল হয়নি, যার মর্মবেদনা কবিকে নাড়া দিয়েছে।

কবি মনোতোষ চক্রবর্তীর[৩১] কবিতায় স্থানিকতা বহুভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। কখনো-বা অবিভক্ত অসমের মিজোরামের প্রসঙ্গে, কখনো-বা বরাকের ভুবন পাহাড়ের বিষয়ে আবার কখনো সরাসরি শিলচর শহরের নাম প্রসঙ্গে।

কবি মনোতোষ এভাবে লিখছেন—

'প্রসারিত করো হাত, যে হাতে মৈত্রীর সাদা ফুল
কানন সাজাবে। আজ ভয়ে পালিয়েছে ইঁদুরেরা
বাঁশ গাছে ফুটবে না ফুল, যে ফুলে ইঁদুর আসে

.....

মৈত্রীর স্বাক্ষর আজ নতুন দিনের আশ্চর্য প্রতীক।

.....

আজ হাস্যোজ্জ্বল মিজো তরুণীরা
রঙিন পোশাকে ঝলমল-বার্মিজ ছাত্রটি মেলে
নেমে আসুক না আমাদের শান্ত সমতলে, আজ
সমস্ত বৈরী সাজ ত্যাগ করে মিত্র হাত প্রসারিত করো।' (তদেব, পৃ. ১১৬)

মানুষের মধ্যে হিংসা বিভেদের বীজ যেভাবে আমাদের মনকে বিষিয়ে দিচ্ছে, বাড়ছে শুধু শত্রুতা তারই বিরুদ্ধে কবির প্রতিবাদ। কবি চেয়েছেন মৈত্রী সমস্ত উত্তরপূর্ব এক বন্ধনে একাকার হোক। বাড়ুক আমাদের শক্তি কিংবা কবি মনোতাষ বলছেন—

'ভুবন পাহাড়ে সূর্যোদয় ; আমার বাল্যছবি
সেই ছবির ভিতরে আকাঙক্ষার মেঘ আর বাদলঘন দিন
সেই ছবির ভিতরে পালা-পার্বণ, যাত্রাগান
মায়ের সাবিত্রীব্রত

.....

প্রতিদিনের সূর্যোদয় আমাদের দারিদ্র্য ভোলানোর উত্থান
ভুবন পাহাড়ে সূর্যোদয়।' (তদেব, পৃ. ১১৬)

কী এক নস্টালজিয়া রয়েছে এই কবিতায়। সেই বাল্যকালের স্মৃতি, আকাঙ্ক্ষা এবং পূজা পার্বণ, ব্রত আর প্রত্যেক সুর্যোদয়ে নতুন আশার আলোর কথা।

'দর্পণ' কবিতায় কবি মনোতোষ লিখছেন সেই ভুবন পাহাড়েই[৩২] বৃষ্টির কথা। আবার ফসল ফলবে, মাছের দাম সস্তা হবে। চতুর্দিক ডুবে যাবে আনন্দ জোয়ারে। কারণ,

'এবছরে

বন্ধ্যা নারী হবে পুত্রপ্রসবিনী।'

শুধু তাই-ই নয় কবির প্রেমিকার সঙ্গেও দেখা হয় এভাবে

'আমাদের দৃষ্টি-বিনিময় হল শিলচর শহরে।' (তদেব, পৃ. ১১৭)

অনিতা দাস ট্যান্ডন[৩৩] বরাকের কবিদের মধ্যে অন্যতম এবং একটু ব্যতিক্রমী কবি। তিনি পাঞ্জাবের কন্যা আর বরাকের বধূ। কথায় বলে না, মেয়েরা যে পাত্রে যায় সেই পাত্রের আকার ধারণ করে—অর্থাৎ শিকড় উপড়ে চলে আসে যে অপরিচিত ঘরে, তাকেই আপন করে নিতে পারে মেয়েরা। কবি অনিতার ক্ষেত্রে এই যুক্তি সম্পূর্ণ অর্থে প্রযোজ্য। একজন পাঞ্জাবি হয়ে বরাকে এসে বাংলায় কবিতা লিখে বাংলা কবিতা চর্চার মূলস্রোতে নিজেকে মিশিয়ে নিতে পারাটা চারটিখানি কথা নয়। ত্রিপুরার জনজাতীয় ককবরক ভাষায় কবিতা পড়ার একটি অভিজ্ঞতার কথা পাই অনিতা দাস ট্যান্ডনের 'নোয়াই পাখি'[৩৪] কবিতায়। কবি লিখছেন—

'নোয়াই পাখি, তুমি ফিরে এসো

নোয়াই পাখি, তুমি ফিরে এসো

তোমার পালকে লুকানো চিঠিটি

আজও তুমি কাউকে দিতে পারনি

.....

বসে আছি তোমার পালকে

লুকানো সেই চিঠির অপেক্ষায়

যা আমিই গুঁজে দিয়েছিলাম

কোনো এক জন্মে' (তদেব, পৃ. ১৭৯)

উল্লেখ্য 'নোয়াই পাখি' নামটা সম্ভবত ককবরক জনজাতির দেওয়া। কিন্তু কবি এখানে সেই 'নোয়াই পাখি'-কে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন তার পালকে তিনি যে চিঠিটা গুঁজে দিয়েছিলেন কোনো জন্মে সেটা নিয়ে আসার জন্য। অর্থাৎ কবি এক অর্থে স্বীকারই করছেন যে আজ তিনি যে ভাষার বা স্থানের মানুষই হোক না কেন, কোনো এক জন্মে এই ককবরক[৩৫] জাতির নোয়াই পাখির সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ ছিল।

বস্তুত স্থানিকতা অসমের দুই উপত্যকার কবিদেরই একটি মূল বৈশিষ্ট্য। কারণ দুই উপত্যকার কবিরাই হয় ১৯৪৭-এর পর কিংবা ১৯৭১-এর পর এসে অসমে থিতু হয়েছেন বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য

দিয়ে। আবার যাঁরা অসমেই জন্মেছেন তাঁদের মধ্যেও স্থানিক বৈশিষ্ট্য প্রভাব ফেলেছে বিভিন্ন কারণে।

মোদ্দা কথা অসমের কবিগোষ্ঠীদের মধ্যে হাতে গোনা কবিরা ছাড়া স্থানিকতা ব্যবহার করেছেন প্রত্যেকেই।

বহু প্রতিকূলতা, ঝড়-ঝঞ্ঝা সত্ত্বেও কিন্তু কবির কলম থামেনি, থামবে না। বরং আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে অসমের কবিতা বিশ্বের বাংলা কবিতা চর্চার মূলস্রোতের নিজের স্থানটা আরও পোক্ত করবে।

বরাকভূমির কবিদের থেকে সরিয়ে গিয়ে আমরা এবার দৃষ্টি নিবদ্ধ করি ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার কবিদের রচনায়। অসমের বাংলা কবিতায় স্থানিকতার উদাহরণ প্রচুর। প্রায় সব কবিই সংশ্লিষ্ট অঞ্চলকে তুলে এনেছেন কবিতায়। হেমাঙ্গ বিশ্বাস থেকে শুরু করে আজকের অর্জুন দাস—সবাই কোনো না কোনো স্থান নাম ব্যবহার করেছেন। হেমাঙ্গ বিশ্বাসের একটি কবিতায় পাই—

উমখ্রা নদীর ঝিরঝির

নুড়ির তালে তাল রেখে।

আবার সঞ্জয় চক্রবর্তী লিখছেন—

'আমি যেমন যাব বিহুতলি, শুনব পার্বতী প্রসাদের গীত

আমি যেমন যাব বিহুতলি, শুনব পার্বতীপ্রসাদের গীত

তুমিও তেমনি। হঠাৎ কখনও, শুনে নিও রবীন্দ্রসঙ্গীত।' (উৎসবের টেবিল, পৃ. ২১)

প্রকৃতপক্ষে প্রায় সব কবির মধ্যেই স্থানিকতার উদাহরণ বিদ্যমান। এঁরা যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কবি, এই সত্য কখনো ভুলতে পারেননি। হয়তো সেজন্যেই এঁদের কবিতায় অন্যস্বাদ। অন্য গন্ধ, অন্য রূপ তার পারিপার্শ্বিকতা নিয়ে উঠে এসেছে। অমলেন্দু গুহর[৩৬] একটি কবিতা যেমন —

'দৃঢ়উরু মেয়েদের পদপাতে নেচে ওঠে ঢেঁকি

.....

অনেক কপৌফুল গুঁজেছি খোঁপায় তোর সই!' (উত্তর পূর্বের বাংলা কবিতা, পৃ. ৪৬)

এই কবিতার নাম 'বিহু', যা অসমের সবচেয়ে বড় উৎসব। বসন্তকালে কপৌফুল অসমের প্রকৃতিকে রঙিন করে তোলে। এবং এভাবেই কবিতায় স্থানিকতা ফুটে ওঠে।

অসমের অন্যতম মানী প্রাবন্ধিক মানিক দাস লিখেছেন '....উদ্বাস্তু মানসিকতা আর পারিপার্শ্বিক চাপজনিত অবদমন বাঙালি চেতনাকে কাবু করে রেখেছিল বা রেখেছে। এর ফলে যা কাজ হয়েছে মূলত ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায়, ব্যক্তিগত উদ্যোগে। আত্মপ্রকাশের প্রবল তাগিদেই এক-একজন বাধ্য হয়েছেন কাগজ করতে। লিখতে। লেখা জোগাড় করতে। বেঁচে থাকাকে অর্থময়তা দিতে।

'...সেজন্য তাঁদের প্রত্যেকের উদ্যোগ, তা যত ক্ষুদ্রই হোক, কুর্নিশযোগ্য।' (বাংলা কবিতা চর্চার রূপরেখা, পৃ. ৩৬৭)

দেশভাগের আগে প্রতিষ্ঠিত পরিবারের বাঙালি-অসমিয়া যুবকেরা পড়াশোনা করতে যেতেন কলকাতায়। এখনও যান তবে কলকাতায় নয়, বাঙ্গালোর-দিল্লিতে। অসমের বিখ্যাত সন্তান লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া কলকাতায় গিয়ে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সংস্পর্শে আসেন এবং তার আচার-সংস্কৃতি দেখে মুগ্ধ হয়ে পড়েন। সেই পরিবারের মেয়েকেই তিনি বিয়ে করেছিলেন। 'সাহিত্যরথী'[৩৭] লক্ষ্মীনাথের[৩৮] হাত ধরে অসমিয়া সাহিত্য-সংস্কৃতির নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছিল একথা অবশ্য স্বীকার্য।

ঠিক লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার মতো লুইত পার থেকে গত শতাব্দীর চারের দশকে কলকাতায় পড়তে যান অমলেন্দু গুহ। জন্মেছিলেন মণিপুরের[৩৯] ইম্ফল শহরে ১৯২৪ সালে। ১৯৩৯-এ গুয়াহাটিতে দুটি মার্কসবাদী পাঠচক্র ছিল। অমলেন্দু আকর্ষিত হয়েছিলেন তৎকালীন বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির নেতা সৌমেন ঠাকুরের।

কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে[৪০] পড়তেন অমলেন্দু। প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াশোনা করার সময় অমলেন্দু বিভিন্ন বামপন্থী তাত্ত্বিক ও কবির সান্নিধ্যে আসেন। এবং নিজেও কবিতা লিখতে শুরু করেন। তাঁর কবিতা তখন প্রকাশিত হয়েছে 'নতুন সাহিত্য', 'অরণি',[৪০] 'পরিচয়'[৪১]-এর মতো নামী পত্রিকায়। কলকাতায় ছাত্রাবস্থাতেই অমলেন্দুর অতি বিখ্যাত 'ট্রাম'[৪৩] কবিতাটি একটি পুস্তিকাতে স্থান পায়।

প্রেসিডেন্সি কলেজ-জীবনে অমলেন্দুর লেখা কবিতাগুলি নিয়ে 'লুইত পারের গাথা'[৪৪] বইটি ছেপেছিল কলকাতার নতুন সাহিত্য ভবন[৪৫]। সেটা ১৯৫৫। এর আগে ১৯৪০ সালে কবি বিহারী সিনহার[৪৬] 'গীতমঞ্জরী'[৪৭] প্রকাশিত হয় গুয়াহাটি থেকে।

লুইত পারের প্রথম প্রকাশিত কবিতাগ্রন্থের মালিক অমলেন্দু গুহ। বইটির নামের মধ্যেও জড়িয়ে রয়েছে অসমের এক প্রধান নদীর নাম। লুইত শব্দের অর্থ ব্রহ্মপুত্র। নামকবিতায় পাওয়া যাচ্ছে লুইত,[৪৮] শিপিনী,[৪৯] রিহামেখলা,[৫০] বহাগী,[৫১] নাহর,[৫২] ভৈয়াম,[৫৩] কপৌ[৫৪]-এর মতো শব্দ। এসবের মানে সাধারণ বাঙালি পাঠকের বোঝার কথা নয়। কিন্তু অমলেন্দু এসব শব্দ ব্যবহার করেছেন একেবারে জলবৎ তরলং ঢংয়ে। প্রকৃতপক্ষে অমলেন্দু প্রথম থেকেই লুইত পারের গন্ধ-রস-সংস্কৃতি শুষে নিয়েছেন, তাঁর কবিতা পড়লেই বোঝা যায় এই কবি কোন অঞ্চলের।

'এখানে স্বপ্নের মতো আমার সত্তার সাথে/জড়ানো ছড়ানো এক দেশ-/
আমি ভালোবাসি তার বনরাজিনীল পরিবেশ।/... ... কমলার কুঞ্জে কুঞ্জে
রসলুব্ধ মৌমাছির ভিড়/... ... কখনও-বা প্রথম বৈশাখে/ শিপিনী কুমারী
সাজে আনকোরা রিহামেখলায়।' (লুইত পারের গাথা)

(উত্তর পূর্বের বাংলা কবিতা, পৃ. ৪২)

স্বপ্নের মতো সত্তার সঙ্গে জড়িয়ে, ছড়িয়ে থাকে বনরাজিনীল লুইত পারের পরিবেশ। ১ বৈশাখ বাংলার মতো অসমিয়াতেও নববর্ষ। নববর্ষে নতুন বস্ত্র পরার বিষয়টি রয়েছে—আনকোরা রিহামেখলায়। একটু পরেই এই কবিতায় পাওয়া যায় 'বহাগীর আমন্ত্রণ', 'কলঙের জলোচ্ছ্বাস', 'জুমখেত', 'ভৈয়ামের ভিজে মাটি',[৫৬] 'লুইতের গতিবেগ' প্রভৃতি শব্দ। আর অমলেন্দু নিজের অবস্থান চূড়ান্ত করে দেন 'শান্তির নিবিড় নীড় আমার আসাম' লিখে।

অস্বস্তিকর দশক ভাগের প্রবণতা থেকে বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিতকে ষাটের দশকে রাখা যায়। যদিও তাঁর কাব্যচর্চার শুরু পঞ্চাশের দশকে। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'পরবাসী' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৯-এ। প্রথম থেকেই বীরেন্দ্রনাথ কবিতা লেখার নিজস্ব স্টাইল নির্মাণ করেছেন। এই কবির পরবর্তী তিনটি কাব্যগ্রন্থ হলো— সাক্ষাৎকার,[৫৭] একা যাবে ও ৩২ যোগিনী বসিবেক।

বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত আদতে পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হয়ে এই লুইত পারে আসেন। উপরে উল্লিখিত তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্যের একটা অন্য ধারা দেখতে পাওয়া গেলেও এই অঞ্চলে বসবাস করার ফলে স্থানিকতার বৈশিষ্ট্য থেকে তিনিও বাদ পড়েননি। তাঁর 'চিঠি' নামের একটি কবিতা যা 'এই আলো হাওয়া রোদ্দুরে'[৫৮] নামে নামে কবিতা সংকলনে প্রকাশিত হয়, সেখানে সরাসরি ফুটে উঠেছে এই উত্তরপূর্বের স্থান নাম। তিনি লিখেছেন—

'চেরাপুঞ্জি থেকে ভায়া শিলং-অবিশ্বাস্য আঁচলের খুঁটে

পাঠাও যে মেঘ, তার পাঁচ হাজার ফুট নিচে-জল

প'ড়ে আছে বাংলাভাষায়।'

আবার 'নাইন্‌থ কলাম'[৫৯]-এর উদ্যোগে প্রকাশিত 'উত্তরপূর্বের বাংলা কবিতা' নামক কবিতা সংকলনে বীরেন রক্ষিত লিখেছেন—

'নদীতে কী উপলক্ষে শরাইঘাটের জলরঙ

ছবিতে আগুন লাগে—

....

চোখের আরামও সেই নৌকো বাঁধা আছে।' (তদেব, পৃ. ৫৯)

— কবিতাটির নাম 'শরাইঘাট ব্রিজ থেকে'।[৬০]

এভাবেই বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত তাঁর নিজস্ব ছন্দনৈপুন্য, যতিচিহ্ন, বিশেষণ, ইমেজ, স্থানিকতা ও স্বকীয়তা নিয়ে থেকে যাবেন অম্লান,

স্বাধীনতা উত্তর কালে অমলেন্দু গুহ একা যে ধারার মশাল বয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, তার সার্থক উত্তরসূরি হলেন ঊর্ধ্বেন্দু দাশ। ষাটের দশকে উজান অসম থেকে দুটি ছোটো পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন তিনি। সংবর্ত ও মজলিস-এ বহু তরুণ কবির প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। বস্তুত ঊর্ধ্বেন্দুকে ঘিরেই ওইসময় ডিব্রুগড় ও তৎসংলগ্ন এলাকায় উত্তর-পূর্বের বাংলা কবিতা-গল্প-প্রবন্ধ গতি পেয়েছিল। অসমে যাঁরা এতদিন ধরে কবিতা লিখেছেন, ঊর্ধ্বেন্দু অন্যতম সেরা। 'বিষণ্ণ পরবাস, নির্বাসন নয়', 'ঘরে তার ফেরা বা না-ফেরা' ও 'এই লজ্জা তোমার আমার' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তাঁর। চুম্বকে ঊর্ধ্বেন্দুকে ধরতে হলে বলা যায়, সমাজমনস্ক কবি নানাসময়ে জীবনের নানা অনুভবের কথা লিখেছেন। ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, বস্তুনিষ্ঠ মানসিকতা বা সমাজের ওপর ক্ষুব্ধ বিক্ষোভ দেখা যায় তাঁর কবিতায়। আর নাগরিক জীবনের অবিসম্বাদিত ক্লান্তি কবিকে করেছে একাকী অন্ধকারের যাত্রী। ঊর্ধ্বেন্দুর 'সাকিন আসাম, ১৯৮৩' ইতিমধ্যেই ইতিহাসে পা রেখেছে।

'ভগ্নস্তূপের মাঝে এই পরিত্যক্ত গাঁয়ের চাতালে

আশি বছরের পোড়া রূপের দেমাক নিয়ে শুয়ে আছে আমার নানিমা'

খুব সচেতনভাবে ঠাকুমা নন, নানিমার উল্লেখ করেছেন কবি। কবিতার পটভূমি যে ওই উত্তাল সময়।

'হন্তারক মানুষের জান্তব পদচ্ছাপ বুকে নিয়ে শস্যহীন বসন্তের মাঠ,

রক্তাক্ত পাঁকে দেখো মুখ গুঁজে পড়ে আছে আমার হানিফ চাচা,...

খোদার মসজিদ আর ঈশ্বরের নামঘর, মাঝে শতাব্দীর টানা অন্ধকার পথ,

পথের দুধারে ছিন্ন শিশুর শরীর, ভিন্ন

প্রৌঢ়ের শির, দীর্ণ জননীর যুগল উরোজ।

ওদিকে ভরলি আর এধারে কলঙসুতি, কপিলি, দিখৌ—

লুইতের পার ধরে জলের উজানে যাও, জলের ভাটায় যাও,

শ্মশান—শ্মশান।' (তদেব, পৃ. ৮৭)

ষাটের দশকে ঊর্ধ্বেন্দু দাশের সঙ্গে ডিব্রুগড়ে সাহিত্যচর্চায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ক্ষিতীশ রায়। ডিব্রুগড়ের একটি কলেজে দীর্ঘকাল অধ্যাপনা করেছেন তিনি। তাঁর একক কোনও কাব্যগ্রন্থ নেই। তাঁর ও অসিত দত্তের যুগ্ম কাব্যগ্রন্থ 'দ্বৈত'। এই কবি অবশ্য ঊর্ধ্বেন্দু দাশের সম্পাদনায় 'সংবর্ত' পত্রিকায় অনেক লিখেছেন। একসময় তিনি নিজেও 'সংবর্ত' সম্পাদনা করেছেন। সেখানে ক্ষিতীশ রায়ের কবিতা পাওয়া যায়। 'উত্তর পূর্বাঞ্চলের বাংলা কবিতা' সংকলনে কিন্তু ক্ষিতীশের বেশ কয়েকটি কবিতা স্থান পেয়েছে। যুগ্মভাবে 'সংবর্ত' সম্পাদনার পর তিনি একক সম্পাদনায় বের করেন 'সাংস্কৃতিকী'।

বাংলা সাহিত্যের মূলধারায় স্থান পাওয়ার কথা ভেবে ইদানীংকালে অসমের কিছু বাঙালি যুবক সচেতনভাবে কবিতা-গল্পে লুইত পারের কথা লেখেন না। কিন্তু সমাজসচেতন ক্ষিতীশ সেই জলে ডুব দেননি। তাঁর 'নতুন মাতৃভূমি' কবিতা সেই ষাটের দশকেই যাকে বলে 'হিট'। এবং এখনও এই কবিতার বাস্তবতা অস্বীকার করা যায় না।

'নতুন মাতৃভূমি' নামেই কবিতার ভাববস্তু পরিস্ফুট। শুধু বাংলাদেশ নয়, পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা থেকেও প্রচুর বাঙালি এসেছেন অসমে। এবং থেকে গেছেন। তাঁদের কাছেও এই অসম, ব্রহ্মপুত্র পার হলো নতুন মাতৃভূমি। এই কবি অবশ্য নিজেই স্বীকার করে নেন যে তাঁর জন্ম বাংলাদেশে। তিনি এসেছেন সেখান থেকেই—

'পহার-ভৈয়াম হাতে হাত রেখে

যেখানে অনাদি কাল হতে

রয়েছে দাঁড়িয়ে

লক্ষ্য সমুখের দিকে—' (বাংলা কবিতাচর্চার রূপরেখা, পৃ. ৩৭১)

ব্রহ্মপুত্র পারের বাঙালি কবিদের মধ্যে ঊর্ধ্বেন্দু দাশই প্রথম সচেতনভাবে সমমনস্কদের নিয়ে লিটল

ম্যাগাজিন, কবিতা লেখা, পত্রপত্রিকা সংগ্রহ, সাহিত্যের নতুন ফর্ম নিয়ে ভেবেছেন। তাঁর সেই সময়ের অবিচ্ছেদ্য কমরেড ছিলেন ক্ষিতীশ রায়।

ষাটের দশকে ডিব্রুগড়ে ঊর্ধ্বেন্দু দাশ যেমন কাব্যচর্চায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ঠিক তেমনই নগাঁওয়ে বসে একমনে কবিতা লিখেছেন জীবন নাথ। অমলেন্দুর বাংলা কবিতাবই একটিই, কিন্তু জীবন নাথ বেশ কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের প্রণেতা। তাঁর 'শাশ্বতী সমা',[৬১] 'মা নিষাদ',[৬২] 'পুষ্পমোচনের উদ্ভিন্ন রাগে',[৬৩] 'স্বগত'[৬৪]-র বিভিন্ন পঙ্‌ক্তি এখনও প্রবীণদের মুখে শোনা যায়। ব্রহ্মপুত্রপারের জল-মাটি-বাতাস তাঁকে কতটা শুষে নিয়েছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর সম্পাদিত লিটল ম্যাগাজিনের নাম 'ব্রহ্মপুত্রে ভাসমান ভেলা'-র মধ্যে।

রমানাথ ভট্টাচার্য শিলংয়ে কাব্যচর্চা শুরু করলেও জীবনের একটা বড়ো সময় কাটিয়েছেন ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বিশেষ করে গুয়াহাটিতে। তাঁর 'লৌকিক বৃত্তের ভিতর', 'এবং পৃথিবী' ও 'লুইতের পদাবলী' এই তিনটি কাব্যগ্রন্থ রয়েছে। সম্পাদনা করেছেন কবিতা পত্রিকা 'শিলঙের কবিতা'। নাইন্‌থ কলামের উদ্যোগে প্রকাশিত উত্তরপূর্বে বাংলা কবিতা নামক কবিতা সংকলনে রমানাথের 'লুইতের পদাবলী' সরাসরি স্থানিকতার ছবি ফুটে উঠেছে। রমানাথ লিখছেন—

'রাতের পাখি ডাকছে কী রকম কী রকম করছে
বুক ছিঁড়ে যাচ্ছে হাড় ভেঙে যাচ্ছে প্রাণ উড়ে যাচ্ছে
কী এক বিষাদ ভয় কুরে-কুরে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে
মনে হচ্ছে এই বুঝি কে এসে নিয়েই যাবে
ভেসে যাবে ঘর-দোর হাওয়া হবে বাড়ি
.....
ঝড়, উন্মাদ ঝড় বুকে উঠে আসছে
কী রকম কী রকম কী রকম করছে।' (উত্তর পূর্বের বাংলা কবিতা, পৃ. ৮১)

কবিতা যে প্রকৃতপক্ষে মন্ত্র—এই বোধ নিয়ে অসমে প্রথম কবিতা লেখেন সত্যেন চৌধুরী। মরিয়নির অধ্যাপক সত্যেন চৌধুরী বয়সে ঊর্ধ্বেন্দু দাশ, ক্ষিতীশ রায়ের প্রায় সমসাময়িক। অসমিয়া কবি দুর্গা হাজরিকার[৬৫] সঙ্গে যৌথভাবে তিনি একটি কবিতাপুস্তিকা প্রকাশ করেন ১৯৭১ সালে। সাঁকো নামক ওই পুস্তিকায় সত্যেনের কবিতা রয়েছে চৌদ্দটি। এবং এ ছাড়া তাঁর আর কোনও কবিতা কোথাও চোখে পড়েনি। অনেকটা সমর সেনের মতোই কবিতা জগৎ থেকে স্বেচ্ছা নির্বাসন নিয়েছেন এই কবি এরকমই বোধ হয়। অথচ সমকালীন সময়ে সত্যেন চৌধুরী[৬৬] ছিলেন সবচেয়ে শক্তিমান অন্তত তাঁর কবিতা তো তাই বলছে। তাঁর প্রত্যেক কবিতাই উল্লেখযোগ্য। কিন্তু একেবারেই অপ্রচারিত এবং অনালোচিত এই কবি। কিছুটা বিস্ময়করও বটে।

ভোগদৈ ; তোমার রুপোলি খামে
আমি—

আমার মায়ের চিঠি পাই।

নিশুতি রাতে—

যুদ্ধ যখন থেমে যায়

পরাজিত সৈনিক

বিপক্ষ দলের শিবিরে বন্দী

তখন—

ভোগদৈ ; তোমার রুপোলি খামে

সোনালি চিঠি আসে।

আর—

সে চিঠিতে মুক্তির আনন্দ।

মায়ের চিঠি কবিতায় এই ভোগদৈ[৬৭] উজান অসমের একটি নদী।

অসমের ছোট্ট জনপদ খারুপেটিয়া থেকে প্রমোদরঞ্জন সাহা[৬৮] কবিতা লিখতে শুরু করেন ষাটের দশকে। ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন এই সময়েরই ফসল। এবং তাঁর কবিতায় সার্থকভাবেই ফুটে উঠেছে অসমিয়া-বাঙালি দাঙ্গার মনন—

'অসমে এখন রক্তধূলির ঝড়/ কোন আকাশে উঠাবে রামধনু/

হে অনেকদিনের ঈশ্বর /বলো না গো জননী/গহপুর কোকরাঝাড়ে

ব্রহ্মপুত্র আছে কি নেই?'

(তবু গ্রীষ্ম)

(বাংলা কবিতাচর্চার রূপরেখা, পৃ. ৩৭২)

সত্যিই তখন অসমে ছিল রক্তধূলির ঝড়।

কবি হিসেবে অসমের বাঙালি পাঠক কুমার অজিত দত্তকে[৬৯] মনে রাখেননি। সাম্প্রতিক কালে তিনি বিখ্যাত হয়ে রয়েছেন ছোটোগল্পের জন্য। কিন্তু গুয়াহাটির কবিতাচর্চা ও লিটল ম্যাগাজিনের ইতিহাস তৈরি করতে গেলে অজিত থাকবেন একেবারে প্রথম সারিতে হয়তো বা শীর্ষেই। মাটির ডানায় অশ্রু-র দুবছর পরেই তিনি প্রকাশ করেন সম্পাদিত ছোটো পত্রিকা 'স্বরের আড়ালে শ্রুতি'। মজলিস-সংবর্ত প্রকাশ করে ঊর্ধ্বেন্দু দাশেরা যা করেছেন, একই কাজ গুয়াহাটিতে করেন অজিত দত্ত। অজিতের আরও বড়ো কাজ হলো প্রায় পাশাপাশি সময় 'উত্তর পূর্বাঞ্চলের বাংলা কবিতা' সংকলন সম্পাদনা। এই সংকলনে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রায় সমস্ত কবি স্থান পেয়েছিলেন। আজও এটিকে উত্তর-পূর্বের বাংলা কবিতাচর্চার ক্ষেত্রে আকরগ্রন্থ বলে ধরা হয়। অজিতের এই কর্মকাণ্ডই পরবর্তী পর্যায়ে উদয়ন বিশ্বাস সম্পাদিত 'একা

এবং কয়েকজন' বা সঞ্জয় চক্রবর্তীর 'মহাবাহু' কিংবা দিলীপ দাসের 'মাজুলি' প্রমুখ ছোটো পত্রিকার প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে দেয় ও প্রেরণা জোগায়।

কিশোর ভট্টাচার্যের[৭০] 'বিহুগীতের বদলে একটি কবিতা'-য়[৭১] লুইতপারের স্বাভাবিক অনুষঙ্গ বিরাজমান।

মোষের শিঙের মতো তীব্র বাঁশির ডাক শুনি

পেঁপা নামে এক বাঁশি আছে যা মোষের শিং দিয়ে তৈরি হয়। এই অনুভব অসমের বিশেষ করে ব্রহ্মপুত্রের পারের কবি ছাড়া সম্ভব নয়।

আর কিশোরের ওই কবিতা তো এখন মিথ—হুররে আজ আসাম অ্যাকর্ড।

ইদানীংকালে নীরব কবি যদি কাউকে বলা যায় তো তিনি তপন মহন্ত। কবিতার বই 'অন্ধকারে পৌর্ণমাসী'[৭২] এবং দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'সময় অস্থিময়'[৭৩]। এই সময়ে গোটা বিশ্ব জুড়েই সন্ত্রাস এক বিশেষ স্থান অধিকার করে নিয়েছে। অসম তথা উত্তর-পূর্বে তো সন্ত্রাসের আশঙ্কা আরও তীব্র। পথে নামলেই মনে হয়, এই বুঝি বিস্ফোরণে উড়ে গেলাম। রাতে বাড়ি ফেরার পথে খুন হয়ে যেতে পারি। বিমানে উঠলে হাইজ্যাকের আশঙ্কা। তপন নিজের মতো করে লিখেছেন—

'আজকাল পথে নামলেই টের পাই

অহেতুক ধুকপুক বুকের গভীরে

বাসে বসে চুপচাপ ভাবি বিস্ফোরণ

সহযাত্রীকে আড়চোখে চলন্ত ট্রেনের কামরায়

বিমানে হাইজ্যাক মাছিটা ভন ভন করেই

ফুটপাতে চকচকে ইস্পাতের ফলা

নোলার মতো জিভটা বাড়িয়েই থাকে' (তদেব, পৃ. ৩৭৫)

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বিস্ফোরণ-নাশকতা প্রায় জলভাতের সমান হয়ে গেছে। অন্তত তপনের কবিতা তাই বলছে—

'ক্যামেরার মুখোমুখি বসে

উনি বললেন,

দুর্ঘটনার কারণ এখনও অজ্ঞাত

নাশকতা হতে পারে নাও হতে পারে

তদন্ত চলছে...

পত্রিকা অফিসে

খবর পাঠাল সাংবাদিক

গতবারের রিপোর্টটাই ছাপতে দিল

অবশ্যই স্থান কাল পাল্টে।' (তদেব, পৃ. ৩৭৫)

আশির দশকে গুয়াহাটিতে উদয়ন বিশ্বাস প্রকাশ করলেন 'একা এবং কয়েকজন'[৭৪]। ওই ছোটো পত্রিকায় কয়েকজন শক্তিশালী কবিকে দেখা যায়। গৌতম মিত্র,[৭৫] তপন রায়,[৭৬] সুব্রত চৌধুরী,[৭৭] সঞ্জয় চক্রবর্তীরা[৭৮] সেই সময় কলম হাতে উঠে এলেন। উদয়নের 'একা এবং কয়েকজন' যে বলিষ্ঠ লিটল ম্যাগ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখিয়েছিল তার অনুপ্রেরণায় গুয়াহাটিতে দুরন্ত কিছু ছোটো পত্রিকা (অধুনালুপ্ত) প্রকাশিত হয়। গৌতম মিত্র-রতন ভট্টাচার্য[৭৯] সম্পাদনা করতেন 'নীল পাহাড় লাল নদী',[৮০] সঞ্জয় ও অভিজিৎ লাহিড়ি[৮১] নিয়ে এলেন 'মহাবাহু',[৮২] সুব্রত চৌধুরীর ছিল 'পত্রপুট',[৮৩] দিলীপ দাসের[৮৪] 'মাজুলি'।[৮৫] আশির শেষ এবং নব্বইয়ের প্রথমার্ধে গুয়াহাটির যে কোনও ছোটো পত্রিকা খুললেই সঞ্জয়-তপন-গৌতম-সুব্রতদের দেখা মিলবেই।

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অন্যতম শক্তিমান কবি সঞ্জয় চক্রবর্তীকে দশকওয়ারি বিশ্লেষণে নব্বইয়ে রাখতে হবে। সঞ্জয়ের একমাত্র কবিতাবই, তরঙ্গতাড়িত, প্রকাশিত হয় ১৯৯৮ সালে। গ্রন্থিত কবিতাপর্ব ছিল ১৯৯২-১৯৯৬। সঞ্জয় সম্পাদনা করতেন 'মহাবাহু' পত্রিকা। লিটল ম্যাগাজিনের স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে যা অচিরেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সম্প্রতি মহাবাহু ফের প্রকাশিত হয়েছে। সঞ্জয়দের সেখানে বিস্তৃত পাওয়া যাবে আশা রইল।

সঞ্জয় এবং তপন রায় যে আঙ্গিকে কবিতা নির্মাণ করেছিলেন ব্রহ্মপুত্র পারে তা অনাস্বাদিত ছিল। সঞ্জয়ের কবিতায় সবসময় কোনও না কোনও বার্তা থাকে, নিদেনপক্ষে বিবরণ। অসমিয়া-বাঙালি সম্পর্ক নিয়ে যাঁরা লেখালিখি করছেন বা করেছেন সঞ্জয় ওই তালিকার উপরের দিকে থাকবেন। এবং সঞ্জয় হচ্ছেন বহির্বিশ্বের কাছে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বাঙালির মুখ।

'ডবকার মেয়েটি কি জানে ঈশ্বরচন্দ্রের কথা?

সে শুধু এক্কাদোক্কা খেলে আর

বাংলাভাষাকে বাঁচিয়ে রাখে পাঠশালায়।'

(বাংলা কবিতাচর্চার রূপরেখা, পৃ. ৩৭৬)

এখানে তথ্য হিসেবে যোগ করা যেতে পারে, ডবকা অসমের একটি স্থানের নাম। মেয়েটির আগে ডবকা বসে দুটি অর্থ তৈরি করেছে। ডবকার মেয়েটি নাকি ডবকা মেয়েটি? নারীশিক্ষার জন্য স্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র[৮৬]। এক্কাদোক্কা খেলা মেয়েটির তাঁর নাম জানার দায় নেই। সে শুধু 'দুয়েক পলক/বৃষ্টিভেজা/বাংলাভাষা'-কে বাঁচিয়ে রাখতে যায় বাংলা মাধ্যমের পাঠশালায় গিয়ে।

ব্রহ্মপুত্র পারে অসমিয়া-বাঙালি সহাবস্থান। সঞ্জয় সঠিকভাবেই লিখেছেন—

'যাদের সঙ্গে আমার দিবস রজনী

তারা জানে না রবীন্দ্র সংগীত।

যেমন আমার ঘরে এখনও বাজেনি

জুবিনের কোনও গীত।'

(তদেব, পৃ. ৩৭৬)

গোটা দিন কেটে যায় অন্যভাষী মানুষের সঙ্গে! রবীন্দ্রনাথকে জানার তাঁদের কোনও দায় নেই। আর বাঙালি কবির ঘরেও বাজেনি অধুনাবিখ্যাত অসমিয়া গায়ক জুবিন গার্গের কোনও গান।

লুইতপারের অসমিয়া-বাঙালিদের সহবাসের কথা সঞ্জয় কখনও বিস্মৃত হন না। তাঁর 'একই বাতাস' কবিতায় এই বার্তা বড়ো নির্দিষ্ট—

'আমি যেমন যাব বিহুতলি, শুনব পার্বতীপ্রসাদের গীত

তুমিও তেমনি, হঠাৎ কখনও, শুনে নিও রবীন্দ্রসংগীত।'

(উৎসবের টেবিল, পৃ. ২১)

সঞ্জয়ের 'শোণিতপুরে রক্তকরবী'[৮৭] ও 'বাবা'[৮৮] প্রায় লোককথায় পরিণত হয়েছে। শক্তিমান এই কবি মৃদুছন্দে অন্ত্যমিলে লিখেছেন 'বাবা'। এই কবিতা এতই তীব্র অথচ সরল যে আলোচনার তোয়াক্কা করে না। আশির দশকে এমন একটা সময় গেছে প্রকাশ্যে বাংলা বলতে ভয় পেতেন বাঙালিরা। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালির কাছে লুইতপারের বাঙালির অন্তর্বেদনাকে সঞ্জয় ধরেছেন অমর 'আমি একা নির্জন ঘরে' কবিতায়।

গঙ্গাপারের ছেলে মনের আনন্দে, খুল্লমখুল্লা, শোনে রবীন্দ্র[৮৯]-দ্বিজেন[৯০]-অতুল[৯১]-নজরুল[৯২]। আতঙ্ক-ত্রাসের লুইতপারে কোনও বাঙালির ঘরে উপর্যুক্ত গান বাজলে ধরে নিতে হবে ভুল হয়েছে—'আমার ঘরেও চুপে বাজেন, যখন করি ভুল।'

গঙ্গাপারের ছেলের মতো লুইতপারের ছেলেও বাংলায় খায়, বাংলায় শোয়, বাংলায় কাঁদে, বাংলায় হাসে। 'স্বপ্ন দেখা—সেও বাংলায়, বাংলায় ভালোবাসাবাসি'। তবে তফাত কোথায়? 'তফাত শুধু এইটুকু/তুমি বুক ফুলিয়ে পাড়ায় পাড়ায়, ট্রামে-বাসের ভিড়ে/আমি একা, নির্জন বিষণ্ণ এক ঘরে'।

মাতৃভাষায় কথা বলতে, গান শুনতে না-পারার যন্ত্রণার এই অভিব্যক্তি শুধু পশ্চিমবঙ্গ কেন, বরাক উপত্যকা বা বাংলাদেশের কোনও কবির কলমে ফোটা অসম্ভব।

'ঈশানকোণ ডট্ কম্'[৯৩] নামক এই কবিতায় সঞ্জয় আরও একটা প্রশ্ন খুব নরম করে রেখেছেন—তোমাদের শুধুই একুশ, উনিশ কি নয়?

সঞ্জয় চক্রবর্তী 'সাকিন' কবিতাতে ব্রহ্মপুত্রের সমস্ত বাঙালি মনের কথা বলে দিয়েছেন মাত্র ১৬ লাইনে।

এপার বাংলা ওপার বাংলার মাঝে

এক অপার বাংলা আছে।

.....

আমি সেই বাংলায় থাকি,

যেখানে, একুশ তত আত্মীয় নয়,

.....

গঙ্গাতীরে দিচ্ছে পাড়ি, ওদের বাড়ি?

এদের সঙ্গে আমার আড়ি।

.....

'তাহলে সুড়ঙ্গই ভালো, ভালো সহাবস্থান

এক হাতে বর্ণপরিচয়, অন্য হাতে তাম্বুলপান;

যখন একা, ভীষণ একা,

হাতে শুধু গীতবিতান।'

(উত্তর পূর্বের বাংলা কবিতা, পৃ. ১৬৭)

গুয়াহাটিতে যেসব কবি বিস্ময়করভাবে অনালোচিত বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত যদি সেই তালিকার ঊর্ধ্বে থাকেন তবে সুব্রত চৌধুরীর স্থান হবে দ্বিতীয়। অথচ নব্বইয়ের প্রথমদিকেই তিনি সম্পাদনা করেছেন কবিতা বিষয়ক ছোটো কাগজ—পত্রপুট। এরপর ১৯৯৭ সালে তাঁর কবিতার বই, শব্দেরা সমবেত কবিতা, বেরিয়ে গেছে। এমনকি ব্রহ্মপুত্রপারের প্রায় সমস্ত পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ পেয়েছেন সুব্রত। সম্ভবত কোনও গোষ্ঠীর সঙ্গে থাকেননি বলেই কবিসমাজেও ব্রাত্য হয়ে রয়েছেন সুব্রত। অসম এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আকাশ-মাটি-গাছ-মানুষ-নদী-ফুলের কথা চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে সুব্রতর কবিতায়।

'এবার শীত জাঁকিয়ে পড়েছে

জাটিংগা পাহাড়ে, কমলালেবু ভোর।'

(বাংলা কবিতাচর্চার রূপরেখা, পৃ. ৩৭৭)

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় এই মুহূর্তে খুব বেশি নারী কবিতা লিখছেন না। উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে শিপ্রা দাস[৯৪] এখন আর তত সৃষ্টিশীল নন। মহিলা কবি একটা লঘু তকমা। তবু বলতে যদি হয়, দীপিকা বিশ্বাসই[৯৫] সেই প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছেন। এবং জয়িতা দাশ পুরকায়স্থের[৯৬] কথাও উল্লেখ্য—তিনি সম্পাদনা করেন 'জললিপি' কবিতাপত্র। কয়েকটি ভালো কবিতা লিখে একেবারে থেমে গেছেন সম্ভাবনাময়ী জাহ্নবী দাশ। এপ্রসঙ্গে মনে পড়ে যাচ্ছে মৈত্রেয়ী রায়চৌধুরীর কথা।

তবে দীপিকা বিশ্বাস যথার্থ অর্থেই ব্রহ্মপুত্রের নারী কবি হিসেবে যথেষ্ট সৃষ্টিশীল। তাঁর দুটি কাব্যগ্রন্থ 'আমাকে এভাবে ভাবো' ও 'আমি কোনদিন বিধবা হব না'[৯৭]— সত্যিই কাব্যরসে ভরপুর। দীপিকা যে

লুইত পারের কবি তা অবশ্যই তিনি ভুলে যাননি। প্রেম বা নারীসত্তা ছাড়াও স্থানিকতাকে এড়িয়ে যাননি দীপিকা।

নাইন্‌থ কলামের উদ্যোগে প্রকাশিত 'উত্তর-পূর্বের বাংলা কবিতা'র সংকলনে 'নিঃসঙ্গতা'[৯৮] নামে কবিতায় দীপিকা লেখেন—

'সন্ধ্যেবেলা ব্রহ্মপুত্রের চরে হাঁটতে আমার খুব ইচ্ছে করে

কিন্তু কখনো হাঁটা হয়নি

কেননা আমার কোনো প্রেমিক নেই

অন্য কারও সাথে হাঁটতে আমার ভালো লাগবেনা'

(উত্তর পূর্বের বাংলা কবিতা, পৃ. ১৬৮)

—কবিতাটি আদ্যন্ত প্রেমহীন এক প্রেমিকার কথা। কিন্তু প্রেমিকের হাত ধরে ব্রহ্মপুত্রের চরে হাঁটতে চাওয়ার ইচ্ছেটাই প্রবল করে দেয় কবির স্থানিকতার মানসকে।

লুইতপারের সাম্প্রতিক কবিদের মধ্যে অন্যতম শক্তিমান নিখিল তালুকদার[৯৯] ইদানীং কবিতা খুব কম লিখছেন। তাঁর জীবনযাপনে কবিতা আর তেমন ধরা দিচ্ছে না। দিল্লিবাসী হয়ে যাওয়ায় কল্লোল প্রায় থেমে গেছেন, জীবিকার তাড়নায় নিখিলকে যেতে হয়েছে বরাক উপত্যকায়। এবং সবাক নিখিলকে আর পাওয়া যাচ্ছে না। ১৫ বছর আগে, ২০০২, নিখিলের একমাত্র কবিতাবই 'আয় বৃষ্টি জোট বাঁধি'[১০০]। নামেই পরিষ্কার হয়ে যায় যে নতুন ভাবনা নিয়ে আবির্ভাব ঘটছে কোনও কবির। কে আর বৃষ্টিকে জোট বাঁধার আহ্বান করেছে!

নিখিলের কবিতায় বিভিন্নভাবে স্থানিক প্রভাব পড়েছে। এবং এই উপত্যকার বাইরে থেকে অসমে বসবাস নয়, নিখিল বরাবর ব্রহ্মপুত্রপারের বাসিন্দা। এজন্যই লেখেন—

'ঠিকানা আমার একটাই

মহাবাহু ব্রহ্মপুত্র।

লিখে নাও

যদি সময় পাও, এসো।' (বাংলা কবিতাচর্চার রূপরেখা, পৃ. ৩৭৯)

পশ্চিমবঙ্গে গিয়ে অনেকের মুখেই শুনতে হয়, ওখানে থাকা যায়? গোলমাল হচ্ছে না তো? এই অনুভূতি নিখিলকেও ছুঁয়ে গেছে—

'ওখানে ভালো থাকা যায়?' জানতে চেয়েছ

অনেকেই।

শুধু অসমিয়া-বাঙালি নন, বোড়ো[১০১], ডিমাসা[১০২], কার্বি[১০৩], মণিপুরি, নেপালি, বিহারি পাশাপাশি রয়েছেন ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায়। কখনও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে কোকরাঝাড়, কখনও অশান্ত হয় কার্বি আংলং, কখনও দাঙ্গা

হয় নগাঁও-বরপেটায় ; কিন্তু আমাদের গভীরতা সেসব স্মৃতিকে অতলে তলিয়ে নিয়ে যায়, পরস্পর আমরা ফের বন্ধু হয়ে উঠি। এখানে 'পরস্পর' শব্দটি অনন্য অভিঘাত এনে দিয়েছে। মহাকবির সেই রচনা '...এক দেহে হল লীন'-এর মতো আমরাও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে গলাগলি করি, অমলিন সোহাগ করি। আর নিখিল এখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রশ্নকারী, সন্দেহ প্রকাশকারী বাঙালিকে জানান—

'এসে দেখে যেও। আমাদের গলাগলি

সহিষ্ণু অবগাহন।' (তদেব, পৃ. ৩৭৯)

ক্রিকেটের ভাষায় বলতে গেলে—অভিজিৎ চক্রবর্তী[১০৫] চুটিয়ে খেলেছেন ২০০০-২০০৪। একদা 'নাইন্‌থ কলাম' পত্রিকার সম্পাদক অভিজিৎ চক্রবর্তী এখনও অপরাজিত। তাঁর সম্পাদিত কাগজ 'কবিতার পূর্বোত্তর'।

তাঁর কবিতা-বই 'অভিজিৎ চক্রবর্তীর কবিতা' প্রকাশিত হয়েছে কুড়ি বছর আগে।

ইদানীং তিনি অসম্ভব তীক্ষ্ণ হয়েছেন। কলম হয়েছে আরও শাণিত। তুলে আনছেন উপজাতি অধ্যুষিত গ্রাম-অসমের কথকথা।

'এ ছবি বুঝি শেষ চৈত্রে আঁকা?

কী ঝড় উঠেছিল মনে? বরদৈচিলা?' (তদেব, পৃ. ৩৭৯)

'সাংসুমা বসুমতারির চিত্রকর্ম'[১০৫] কবিতা এভাবেই শুরু করেছেন কবি। বসুমতারি পদবী থাকলেই বুঝে নেওয়া যায় যে এই ব্যক্তি বোড়ো উপজাতির অন্তর্ভুক্ত। এবং বোড়োদের মধ্যে সাংসুমা অত্যন্ত পরিচিত নাম। কয়েক বছর আগে প্রায় প্রতিদিনই প্রথম পাতায় থাকত অশান্ত বোড়োল্যান্ডের গল্প।

...সমাগত বৈশাগুর দিনে

দয়িত দূরে ছিল বুঝি?—অতি দূর, রাষ্ট্র ছাড়িয়ে

বোড়োদের এক উৎসবের নাম বৈশাগু[১০৬]। অশান্ত বোড়োভূমিতে অনেকেই থাকতে পারেননি, রাষ্ট্র ছাড়িয়ে চলে যেতে হয়েছে অনন্ত শয়নে।

দখনায় সবুজের বাড়াবাড়ি ভিড়

একরাশ পলুদের অনর্গল খিদে

তাঁতশালে সাংসুমা একা একা

কী স্বপ্ন বুনেছিলে তুমি?

বোড়ো জনজাতির মেয়েরা দখনা[১০৭] পরিধান করে। এবং সেটা এখনও নিজেদের ঘরেই তৈরি হয়। এখানে দয়িত চলে গেছে রাষ্ট্র থেকে দূরে। তাঁতশালে সাংসুমা বসুমতারি একা একা স্বপ্ন বুনে যায়। নারীহারা, দয়িতহারা এক প্রেমিক। তাঁর কান্না, তাঁর অভিমান, তাঁর অনুরাগ ঝরে পড়ে এরন্ডার পাতায়। এবং কবির অনিবার্য প্রশ্ন—

'কত অশ্রু সবুজে মেশালে

এমন হরিদ্রাভ হয় এরন্ডার পাতা?'

(তদেব, পৃ. ৩৮০)

—এইভাবেই ব্রহ্মপুত্র ও বরাক পারের কবিতায় স্থানিকতা এক বিশাল স্থান নিয়ে বিরাজ করেছে ও করছে। শুরু করেছিলেন অমলেন্দু, হেমাঙ্গ, শক্তিপদ, বীরেন্দ্রনাথেরা। সেই মশাল এখনও জ্বলন্ত এবং হলফ করে বলা যায় কখনও নিভবে না।

সূত্র সংকেত

১. অশোকবিজয় রাহা— প্রাক্ স্বাধীনতার কাল থেকে বরাকের অন্যতম এক কবি।
২. ডিহাং— উজান অসমের একটি নদীর নাম।
৩. হেমাঙ্গ বিশ্বাস— কবি, গণসংগীত শিল্পী।
৪. 'উমখ্রা —মেঘালয়ের একটি নদীর নাম।
৫. শিলঙের চিঠি— হেমাঙ্গ বিশ্বাসের কবিতা, 'সীমান্ত প্রহরী' কাব্যগ্রন্থে সংকলিত।
৬. সীমান্ত প্রহরী— হেমাঙ্গ বিশ্বাসের একটি কাব্যগ্রন্থ।
৭. ফানক— মণিপুরি মেয়েদের পরিধান।
৮. থাম্বা থৈবী— মণিপুরি মহাকাব্যের নায়ক-নায়িকা।
৯. বিহু— অসমের জাতীয় উৎসব।
১০. পেঁপা— বসন্ত বিহু নৃত্যে ব্যবহৃত মহিষের শিঙের বাঁশি।
১১. লুইত— ব্রহ্মপুত্র নদের আর একটি নাম।
১২ 'ঈশান'— 'ঈশান' একটি কোণের নাম। বরাককে 'ঈশান' নামে অভিহিত করা হয়।
১৩. নীলাচল পাহাড় চূড়া— কামাখ্যা মন্দির যে পাহাড়ে অবস্থিত তাকে নীলাচল পাহাড় বলা হয়।
১৪. রিহাং নৃত্য— আসলে নৃত্যটির নাম রিয়াং নৃত্য। এটি বস্তুত রিয়াং জাতির ওজাগিরি নৃত্যের প্রধান শৈলী।
১৫. রামেন্দ্র দেশমুখ্য— বরাকের একজন অন্যতম কবি।
১৬. মনসামঙ্গল— বাংলা সাহিত্যের মঙ্গল কাব্যের অন্যতম কাব্য।
১৭. 'সাঁঝের ঝিয়ারি'— শক্তিপদ ব্রহ্মচারীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা মনসামঙ্গল কাব্যের উল্লিখিত অংশ। 'সাঁঝের ঝিয়ারি' বলতে পৌরাণিক মনসামঙ্গল কাব্যের অত্যমন চরিত্র সাঁয়বেনের মেয়ে বেহুলার কথা বোঝানো হয়েছে।
১৮. মেখলা— অসমিয়া মহিলাদের পরিধেয় বস্ত্র।
১৯. তাম্বুল— কাঁচা সুপারি যা অসমে পানের সঙ্গে সম্মান জানাতে একসঙ্গে দেওয়া হয়। পান-তাম্বুল দেওয়া অসমিয়া সংস্কৃতি বা কৃষ্টি।
২০. অতন্দ্র— বরাকের একটি লিটল ম্যাগাজিনের নাম। সেটিকে ঘিরে বরাকে একটি আন্দোলন গড়ে উঠেছিল।
২১. বরবক্র নদী— বরাক নদীর পূর্বতন নাম।
২২. ব্রুকলীন ব্রিজ— মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি ব্রিজের নাম।
২৩. বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য— বরাকের অন্যতম প্রধান কবি এবং ছোট পত্রিকা 'সাহিত্য'-এর সম্পাদক।
২৪. ছবি গুপ্তা— বরাকের অন্যতম কবি।
২৫. সহবাস— কবি ছবি গুপ্তার কাব্যগ্রন্থ 'শব্দ বিভাবরী'র একটি কবিতা 'সহবাস'।
২৬. শব্দ বিভাবরী— কবি ছবি গুপ্তার কাব্যগ্রন্থ।
২৭. দিলীপকান্তি লস্কর— 'লালনমঞ্চ' পত্রিকার সম্পাদক। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ— 'হাওয়ার দেয়াল মেঘের জগদ্দল', 'রজনীবালার উপাখ্যান', 'মাতৃভূমি, বাংলাভাষা মা' এবং 'অন্য ভুবনভাঙায়'।

২৮. লালন মঞ্চ— দিলীপকান্তি লস্কর সম্পাদিত লিটল ম্যাগাজিন।

২৯. শংকরজ্যোতি দেব— পেশায় ডাক্তার ছিলেন। তবু তাঁর কাব্যকণ্ঠস্বর যথেষ্ট জোরালো ছিল। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ— 'ঘুমের জানালা' এবং 'মহাপ্রস্থান'।

৩০. অমিতাভ দেব চৌধুরী— পেশা শিক্ষকতা। 'অমিতাভ দেব চৌধুরীর কবিতা', 'গতজন্মের কবিতা', 'ঈশ্বরের শেষ গুপ্তচর' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য কাব্যসংকলন।

৩১. মনোতোষ চক্রবর্তী— তাঁর কাব্যসংকলনের নাম 'মেঘ কারো বাড়ি গাড়ি নয়' এবং 'ভুবন পাহাড়'। 'অতন্দ্র'-সময়ে আবির্ভূত এই কবির কবিতায় শোনা যায় এক অদ্ভুত আঁধারের গান— 'যে আঁধার আলোর অধিক'।

৩২. ভুবন পাহাড়— বরাকের একটি পাহাড়ের নাম।

৩৩. অনিতা দাস ট্যান্ডন— জন্মসূত্রে পাঞ্জাবি। নিয়মিত বাংলা ও লখনৌ রীতির হিন্দিতে কাব্যচর্চা করেন। গৃহবধূ অনিতার প্রথম বাংলা বই 'একটি শিশির বিন্দু'।

৩৪. নোয়াই পাখি— ত্রিপুরার একটি পাখি, ককবরক ভাষায় বলা হয় নোয়াই।

৩৫. ককবরক ভাষা— ত্রিপুরার উপজাতিদের ভাষা।

৩৬. অমলেন্দু গুহ— ইতিহাসবিদ হিসেবে সুপরিচিত ও অগ্রগণ্য। প্রথম জীবনে কাব্যচর্চায় মনোনিবেশ করলেও পরবর্তীকালে তিনি কবিতা রচনা থেকে বিরত থেকেছেন। বাংলা ও অসমিয়া ভাষায় প্রকাশিত তাঁর কবিতার বই দুটি হল— 'লুইত পারের গাথা' ও তোমালৈ'।

৩৭. সাহিত্যরথী— অসমিয়া সাহিত্যিক লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়াকে 'সাহিত্যরথী' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। তিনি অসমের এমন একজন সাহিত্যিক যাঁকে 'সাহিত্যরথী' সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে।

৩৮. লক্ষ্মীনাথ— লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া অসমের একজন প্রধান সাহিত্যিক। যাঁকে 'সাহিত্যরথী' আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

৩৯. মণিপুর— অবিভক্ত অসমের একটি অংশ মণিপুর। কিন্তু এখন উত্তর-পূর্বের একটি আলাদা রাজ্য।

৪০. প্রেসিডেন্সি কলেজ— ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কলেজ কলকাতায় অবস্থিত, বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়। অসম তথা পশ্চিমবঙ্গের যত মেধাবী পড়ুয়া ছিলেন, এই কলেজ থেকেই পড়াশোনা করেছেন। অমলেন্দু গুহ এই কলেজের ছাত্র ছিলেন।

৪১. অরণি— এটি একটি ছোট পত্রিকা।

৪২. পরিচয়— দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত একটি ছোট পত্রিকা।

৪৩. ট্রাম— অমলেন্দু গুহের বিখ্যাত কবিতা।

৪৪. লুইত পারের গাথা— অমলেন্দু গুহর একটি মাত্র বাংলা কাব্যগ্রন্থ। তারপর তিনি যা লিখেছেন অসমিয়া সাহিত্যের জন্য লিখেছেন।

৪৫. নতুন সাহিত্য ভবন— কলকাতার প্রকাশনা সংস্থা, অধুনা বিলুপ্ত।

৪৬. বিহারী সিনহা— বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি ভাষার কবি। একমাত্র কাব্যগ্রন্থ 'গীতমঞ্জরী'।

৪৭. 'গীতমঞ্জরী'— বিহারী সিনহার একটি মাত্র কাব্যগ্রন্থ। যা ১৯৪০ সালে গুয়াহাটি থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। তবে 'গীতমঞ্জরী'কে ঠিক কবিতা গ্রন্থ বলা যায় না। বরং গানের বই বললেই যথাযথ হয়।

৪৮. লুইত— ব্রহ্মপুত্রের আরেক নাম।

৪৯. শিপিনী— যে তাঁত বোনে।

৫০. রিহামেখলা— অসমের বসবাসকারীদের পরিধেয় বস্ত্র। যা প্রধানত বহাগ বিহুতেই মেয়েরা পরিধান করে।

৫১. বহাগী— বহাগ বিহুর আমন্ত্রণকে বহাগী বলা হয়।

৫২. নাহর— নাহর এক প্রজাতির ফুল। যা বৈশাখ মাসেই প্রধানত ফোটে।

৫৩. ভৈয়াম— সমতল স্থান।

৫৪. কপৌ— এক প্রজাতির ফুল।

৫৫. ভৈয়ামের ভিজেমাটি— সমতল ভূমির বৃষ্টি ভেজা মাটি।

৫৬. 'লুইতের গতিবেগ'— ব্রহ্মপুত্রের গতিবেগ।

৫৭. সাক্ষাৎকার— বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিতের কাব্যগ্রন্থ।

৫৮. 'এই আলো হাওয়া রোদ্দুর'— বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য এবং শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের দ্বৈত ভাবে সম্পাদিত কবিতা সংকলন যার প্রথম প্রকাশ ১ আষাঢ় ১৯৭৬, 'প্রথম বিশ্বজ্ঞান' সংস্করণ ১৫ আগস্ট ১৯৮৭ (২৯ শ্রাবণ ১৩৯৪, প্রকাশক দেবকুমার বসু ৯/৩ টেমার লেন কলকাতা ৭০০০০৯)।

৫৯. 'নাইন্‌থ কলাম'— অসমের অন্যতম লিটল ম্যাগাজিন। যার সম্পাদকত্রয়ী ছিলেন ড. প্রসূন বর্মন, ড. সৌমেন ভারতীয়া এবং ড. অভিজিৎ চক্রবর্তী, বর্তমানে প্রসূন বর্মনই এই লিটল ম্যাগাজিনটির সার্থক সম্পাদনা করে চলেছেন।

৬০. শরাইঘাট ব্রিজ থেকে— বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিতের কবিতা, 'একা যাবে' কাব্যগ্রন্থে সংকলিত।

৬১. শাশ্বতী সমা— জীবন নাথের কাব্যগ্রন্থ।

৬২. মা নিষাদ— জীবন নাথের কাব্যগ্রন্থ।

৬৩. পুষ্পমোচনের উদ্ভিন্ন রাগে— জীবন নাথের কাব্যগ্রন্থ।

৬৪. স্বগত— জীবন নাথের কাব্যগ্রন্থ।

৬৫. দুর্গা হাজরিকা— অসমিয়া কবি দুর্গা হাজরিকা। তাঁর ও সত্যেন চৌধুরীর কবিতা নিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল দ্বিভাষিক 'সাঁকো' কবিতা-বই।

৬৬. সত্যেন চৌধুরী — ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার একজন অন্যতম কবি এবং মরিয়নি কলেজের অধ্যাপক।

৬৭. ভোগদৈ— উজান অসমের একটি অন্যতম নদী।

৬৮. প্রমোদরঞ্জন সাহা— ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বরিষ্ঠ কবি।

৬৯. কুমার অজিত দত্ত— গল্পকার। সম্পাদিত ছোট পত্রিকা 'স্বরের আড়ালে শ্রুতি'। অজিতের আরও বড় কাজ হল প্রায় পাশাপাশি সময় প্রকাশিত 'উত্তর পূর্বাঞ্চলের বাংলা কবিতা' সংকলন সম্পাদনা। এই সংকলনে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রায় সমস্ত কবি স্থান পেয়েছিলেন।

৭০. বিহুগীত— অসমের জাতীয় উৎসব বিহুর সময় যে গান গাওয়া হয়।

৭১. কিশোর— কিশোর ভট্টাচার্য, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার একজন অন্যতম কবি।

৭২. অন্ধকারে পৌর্ণমাসী— তপন মহন্তের প্রথম কবিতার বই।

৭৩. সময় অস্থিময়— তপন মহন্তের দ্বিতীয় কবিতার বই।

৭৪. একা এবং কয়েকজন— ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার একটি বিখ্যাত লিটল ম্যাগাজিন।

৭৫. গৌতম মিত্র— গৌতম মিত্র এবং রতন ভট্টাচার্য সম্পাদনা করতেন 'নীল পাহাড় লাল নদী' নামে

একটি লিটল ম্যাগাজিন।

৭৬. তপন রায়— আটের দশকে কবিতাচর্চার শুরু। এনএফ রেলওয়ের কর্মী। প্রকাশিত কবিতার বই 'বিধুর লণ্ঠন' ও 'রজকিনীর হাঁস'।

৭৭. সুব্রত চৌধুরী— কবি, লিটল ম্যাগাজিন 'পত্রপুট'-এর সম্পাদক,

৭৮. সঞ্জয় চক্রবর্তী— কবি। 'তঙ্গতাড়িত', 'উৎসবের টেবিল', 'মায়াপাহাড়'— উল্লেখযোগ্য কবিতার বই।

৭৯. রতন ভট্টাচার্য— 'নীল পাহাড় লাল নদী' লিটল ম্যাগাজিনের অন্যতম সম্পাদক।

৮০. নীল পাহাড় লাল নদী— গৌতম মিত্র ও রতন ভট্টাচার্যের সম্পাদিত ছোট পত্রিকা।

৮১. অভিজিৎ লাহিড়ী— 'মহাবাহু' পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক।

৮২. মহাবাহু— সঞ্জয় চক্রবর্তী ও অভিজিৎ লাহিড়ীর সম্পাদিত ছোট পত্রিকা।

৮৩. পত্রপুট— সুব্রত চৌধুরীর সম্পাদিত ছোট পত্রিকা।

৮৪. দিলীপ দাস— অধুনালুপ্ত 'মাজুলি' পত্রিকার সম্পাদক।

৮৫. মাজুলি— দিলীপ দাস সম্পাদিত ছোট পত্রিকা।

৮৬. ঈশ্বরচন্দ্র— ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বাংলায় নারীশিক্ষার প্রবর্তক।

৮৭. শোণিতপুরে রক্তকরবী— সঞ্জয় চক্রবর্তীর একটি বিখ্যাত কবিতা। যা প্রায় লোক কথায় পরিণত হয়েছে।

৮৮. বাবা— সঞ্জয় চক্রবর্তীর একটি কবিতা।

৮৯. রবীন্দ্র— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৯০. দ্বিজেন— দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

৯১. অতুল— অতুলপ্রসাদ সেন।

৯২. নজরুল — কাজী নজরুল ইসলাম।

৯৩. ঈশান কোন ডট্‌কম্— এটি সঞ্জয় চক্রবর্তী বিখ্যাত কবিতা।

৯৪. শিপ্রা দাস— কবি, একমাত্র কাব্যগ্রন্থ 'নস্টালজিয়া'।

৯৫. দীপিকা বিশ্বাস— কবি, উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ— আমাকে এভাবে ভাবো, আমি কখনও বিধবা হবো না এবং পক্ষাঘাতে রৌদ্রমিথুন।

৯৬. জয়িতা দাশ পুরকায়স্থ— ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অনালোচিত কবি। সম্পাদনা করেন 'জললিপি' কবিতা পত্রিকা।

৯৭. আমি কোনদিন বিধবা হবো না— দীপিকা বিশ্বাসের কবিতার বই।

৯৮. নিঃসঙ্গতা— দীপিকা বিশ্বাসের একটি কবিতার নাম।

৯৯. নিখিল তালুকদার— ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার একজন অন্যতম শক্তিমান কবি। তাঁর কবিতার বই— 'আয় বৃষ্টি জোট বাঁধি', 'নদী হও বনানি'।

১০০. আয় বৃষ্টি জোট বাঁধি— নিখিল তালুকদারের একমাত্র কবিতার বই।

১০১. বোড়ো— অসমের এক জনজাতি।

১০২. ডিমাসা— উত্তর-পূর্বের এক জনজাতি। মূলত এরা হাফলং নিবাসী।

১০৩. কার্বি— উত্তর-পূর্বের একটি জনজাতি, যারা মূলত কার্বিআংলং নিবাসী।

১০৪. অভিজিৎ চক্রবর্তী— অসমের টংলা কলেজে বাংলা পড়ান। সম্পাদিত পত্রিকা—'কবিতার পূর্বোত্তর', 'অভিজিৎ চক্রবর্তীর কবিতা' ও 'নদীর নামে চিরকুট'— তাঁর কাব্যসংকলন।

১০৫. সাংসুমা বসুমতারি— অভিজিৎ চক্রবর্তী কবিতার একটি অন্যতম চরিত্র।

১০৬. বৈসাগু— বোড়োদের একটি উৎসবের নাম।

১০৭. দখনা— বোড়োদের পরিধেয় বস্ত্র।